GKw`b মন্টু ewnbxi mšv‡mi ivR‡Z

বাহিনী প্রধান সাইফুল্লাহ বিশ্বাস মন্টু

জবাই করা লাশ নয়তো ধর্ষিত নারীকে। পুরো আতাইকুলা থানা আজ জিম্মি 'মন্টু বাহিনী' নামক এক সাবেক চেয়ারম্যানের বাহিনীর হাতে। হত্যা, খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, চুরি, জমি দখল, ফসল দখল, চাঁদাবাজি- অপকর্মের এমন কোনো কাজ নেই যা এ বাহিনী করছে না। নকশাল উৎখাতের নামে এ বাহিনী আতাইকুলা থানার ইউনিয়ন এবং আশপাশের গ্রামগুলোতে ব্যাপক অন্যায় অত্যাচার শুরু করেছে। নিরীহ গ্রামবাসী এক মুহূর্তও এই বাহিনীর ভয়ে শান্তিতে ঘুমাতে পারে না।

মন্টু বাহিনীর ভয়ে পালিয়ে শহরে চলে আসছে গ্রামগুলোর ছেলে, যুবক, মধ্যবয়সী এমনকি বৃদ্ধ মানুষটিও। সরেজমিন লক্ষ্মীপুর ও শ্রীপুর গ্রাম ঘুরে দেখা গেছে, অধিকাংশ গেরস্থ বাড়িতে 'কামলা' ছাড়া আর কোনো পুরুষ নেই। বাড়ির মেয়ে বা ছেলের বউকে কেউ ঘরে রাখতে সাহস পাচ্ছে না। গ্রাম ছেড়ে এ মানুষগুলো আশ্রয় নিচ্ছে পাবনা শহরে। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, ক্ষমতাসীন বিএনপির নেতা-কর্মীরাও আজ এই বাহিনীর ভয়ে তটস্থ। কিছুদিন আগে

রিপোর্ট : **আসাদুর রহমান**

ঘটনা-১ : cvebvi j²xci Mv‡gi nweei ingv‡bi ewo‡Z i"g i‡q‡Q 5wU| wKš i"g¸‡jv Lwj c‡o Av‡Q| g›U ewnbxi f‡q †Q‡j-‡g‡qiv Mvg Qvov| GZeo ewoi gvÎ GKwU i"‡g e‡ovewo _vK‡Zb| 12 †g g›U ewnbx Lb K‡i nweei ingvb‡K| me nwi‡q ¯x biRvnv‡bi GLb me¶‡Yi m½x nweei ingv‡bi †nj vb †`qv †PqviwU| mviw`b biRvnvb †PqviwUi cv‡k e‡m Kv‡`|

ঘটনা-২ : হাবিবুর রহমান মারা যাওয়ায় লক্ষ্মীপুর গ্রামে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। বাহিনীর আক্রমণের ভয়ে ঐ গ্রামের মানসিক প্রতিবন্ধী মজনুকে তার মা আর বাড়িতে রাখতে সাহস পাননি। পাঠিয়ে দেন চরপাড়ায় তার খালাতো বোনের বাসায়। কিন্তু গ্রামের সবার কাছে পরিচিত এই 'পাগলা মজনু'ও পালিয়ে গিয়ে রেহাই পায়নি। চরপাড়া থেকে ধরে এনে ১৫ মে মজনুকে প্রথম গুলি করা হয়। এরপর তাকে করা হয় জবাই। মজনু কোনো কাজ করতে পারতো না। কিছুদিন আগে পাবনা মানসিক হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছিল। বাড়ির সামনে একটি মুদি দোকান করতো সে। মজনুর মা এখন সারা দিন দোকানের পাশে বসে বিলাপ করেন।

ঘটনা-৩ : বাহিনীর লোকজনের অত্যাচার থেকে বাঁচতে শ্রীপুর গ্রামবাসী পাহারার ব্যবস্থা করে। ২০০০ সালের ৪ ডিসেম্বর। বাহিনীর লোকজন শ্রীপুরের গ্রামবাসীর ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। গুলিতে মোঃ মাহতাব হোসেন

স্বামী হারিয়ে ক্রন্দনরত নুরজাহান

নিহত হন। স্বামীর শোকে পরের বছর মারা যান মাহতাবের স্ত্রী। বাহিনীর লোকজন মাহতাবের পরিবারকে বাধ্য করে থানা থেকে মামলা উঠিয়ে নিতে। মাহতাবের দুই মেয়ে কনা আর রিনা জীবনে ভয় নিয়ে বড় হচ্ছে। তারা আজ আর পিতা হত্যার বিচার চায় না। শুধু চায় নিজের জীবনের নিশ্চয়তা।

পাবনা শহর থেকে বাসে বড় জোর ২০ মিনিটের পথ। এরপর আতাইকুলা থানা। এ থানা এলাকার মানুষ বর্তমানে বীভৎস পরিস্থিতির মুখোমুখি। আগামীকাল বেঁচে থাকার কোনো নিশ্চয়তা তাদের নেই। অন্যদিকে সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখতে হয়

বিএনপির পাবনা জেলা শাখার নিরক্ষরতা ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক রবিউল ইসলামের বৃদ্ধ পিতা হাবিবুর রহমানকে গুলি করে হত্যা করা হয়। মন্টু বাহিনীর ভয়ে লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান আজ নিজ গ্রামে থাকতে পারছেন না। বাহিনীর লোকজন তাকে পেলে যে কোনো সময় হত্যা করবে এ ভয়ে চেয়ারম্যান আজ পাবনা শহরে বাসা ভাড়া করে থাকেন। এতদিন মন্টু বাহিনী তরুণ বা মাঝারি বয়সীদের হত্যা করতো। কিন্তু গত ইউপি নির্বাচনে পরাজিত হয়ে সে বৃদ্ধদের হত্যা শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১২ মে সে প্রথম হত্যা করে লক্ষ্মীপুর গ্রামের ৭০ উর্ধ্ব মোঃ আইয়ুব

আলী শেখকে। বৃদ্ধ আইয়ুব আলীর বাড়ির পাশে ছিল তার টঙ দোকান। মন্টুর ভয়ে তার ছেলেরা গ্রামছাড়া। দোকানের আয় দিয়েই চলতো আইয়ুব আলীর সংসার। জানা যায়, ১১ মে বিলের মধ্যে মন্টু বাহিনী ৪ জনকে জবাই করে খুন করে। পরদিন মন্টু বাহিনী প্রচার করতে থাকে এই লোকগুলো তার দলের। নকশাল বাহিনী তার লোকদের হত্যা করেছে। ১২ মে নিহতের দাফন শেষ করে মন্টু বাহিনী গ্রামবাসীর ওপর চড়াও হয়। প্রথমেই মোঃ আয়ুব আলী শেখকে দোকান থেকে বের করে গুলি ও জবাই করে হত্যা করে। এরপর তারা যায় বিএনপির পাবনা জেলা শাখার নিরক্ষরতা ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবির বাড়িতে। ইউপি নির্বাচনে রবি তার বিরুদ্ধে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হয়েছিলেন। নির্বাচনের পর মন্টুর ভয়ে রবি এখনও বাড়ি ফেরেনি। নির্বাচনে পরাজয়ের ক্ষোভে হত্যা করে রবির পিতা হাবিবুর রহমানকে।

অবস্থা এখন এমন যে, জমিতে কৃষক ফসল ফলাতে পারবে কিন্তু ফসল তোলার অধিকার তার নেই। মন্টুর অনুমতি ছাড়া লক্ষ্মীপুর, শ্রীপুর গ্রামের কোনো কৃষকই জমি থেকে ফসল তুলতে পারে না। বাধ্য হয়েই মাঝে মাঝে গ্রামবাসী পুলিশ নিয়ে মাঠে ফসল তুলতে যায়।

মাহতাবের দুই মেয়ে কনা আর রিনা জীবনে ভয় নিয়ে বড় হচ্ছে

থানা প্রশাসন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে এ বাহিনী প্রধান সাইফুল্লাহ বিশ্বাস মন্টুর রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তাই সে বাধার সম্মুখীন হয় না।

কে এই মন্টু

পাবনা জেলার আটঘরিয়া থানায় লক্ষ্মীপুর গ্রামের বাসিন্দা সাইফুল্লাহ বিশ্বাস মন্টু। বলা যায়, পিতার হাত ধরেই তার অপরাধ জগতে প্রবেশ। পিতা কুদরত উল্লাহ বিশ্বাস স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শান্তি কমিটির মেম্বার ছিল। তার সহযোগিতায় পাকবাহিনী লক্ষ্মীপুর গ্রামের ৩০ জন হিন্দু-মুসলিমকে হত্যা করে। যুদ্ধের পর মুক্তিবাহিনীর হাতে কুদরত উল্লাহ বিশ্বাস নিহত হয়। মন্টুর বড় ভাই জুম্মা খুলনা পোর্টে চাকরি করতো। সেখানে তার মেয়ের সঙ্গে এক ইঞ্জিনিয়ারের প্রেম হয়। সেই ইঞ্জিনিয়ার হঠাৎ খুন হন। সেই হত্যাকান্ডের জন্য পাবনা থেকে মন্টুকে খুলনা নিয়ে যাওয়া হয়। ইঞ্জিনিয়ার হত্যা দিয়ে মন্টুর হাতে ঘড়ি। এরপর তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। একের পর এক

অন্যায় অত্যাচার করে গেছে সে। প্রথমে আশপাশের থানা-গ্রাম পরবর্তীতে সে এই অত্যাচার নিজ গ্রামবাসীর ওপর শুরু করে।

গুলবাড়ী ইউনিয়নের বিশেদপুর, শিবপুর, কুলাবাড়ী ইউনিয়নের গারুলিয়া, হরিপুর, সরগ্রাম, লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর, দাপুনিয়া, শ্রীপুর, একদন্ত ইউনিয়নের চাঁদাই গ্রাম, আতাইকুলা ইউনিয়নের কাছারপুর, গঙ্গারাম- মূলত এ গ্রামগুলোর বাসিন্দারা আজ এই অত্যাচারী মন্টুর হাতে জিম্মি। লক্ষ্মীপুর গ্রামের এক হিন্দু পরিবারের বউকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের মাধ্যমে মন্টুর নারী নির্যাতন শুরু হয়। প্রথম দিকে সে নারী নির্যাতনের জন্য হিন্দু পাড়া বেঁছে নেয়। হিন্দুপাড়ার অনেক মহিলাই তার পাশবিক নির্যাতনের শিকার। এমনকি কোনো সুন্দরী মেয়ে হিন্দুপাড়ায় বেড়াতে এলে ফেরার পথে তাকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করতো বলে কথিত আছে। ভয়ে, লজ্জায়, ঘৃণায় এ এলাকা থেকে হিন্দুরা সরে গেছে। অভিযোগ আছে, টাকার বিনিময়ে বড়াল ব্রিজ এলাকার দুই হিন্দু মহিলাকে ধরে এনে সারা রাত ধর্ষণের পর হত্যা করে এবং সঙ্গে থাকা ৪-৫ মাস বয়সের একটি বাচ্চাকে দু-পা ধরে টেনে দু-ভাগ করে ফেলে। ধর্ষণের পর মহিনি নামক এক মহিলাকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করার মতো ঘটনা ঘটিয়েছে এই মন্টু ও তার বাহিনী।

হিন্দু পরিবারগুলো গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার পর মুসলমান মেয়েরা তার শিকার হয়। আতাইকুলা, আটঘরিয়া থানার গ্রামগুলোতে প্রায় শতাধিক বাড়ি রয়েছে যে বাড়িগুলোর বউ, মেয়ে, নয়তো কাজের মেয়েটি মন্টু বাহিনীর ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ভয় আর লজ্জায় কেউ মুখ খোলে না।

আতাইকুলা থানার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে জানা যায়, মন্টু বাহিনীর হাতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রামে অর্ধ শতাধিক লোক নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০১ কুচিয়ামোরা গ্রামের ৩ জন তাঁত শ্রমিককে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয়। আহত হয়েছে প্রায় শতাধিক লোক।

বাড়ি থেকে পালিয়েও রেহাই পায়নি মানসিক প্রতিবন্ধী মজনু। ছেলেকে হারিয়ে মজনুর মা এখন সারা দিন বিলাপ করে

গরু চুরি থেকে বড় ধরনের ডাকাতি- সব ধরনের অপকর্মের সঙ্গেই মন্টু জড়িত। এ প্রসঙ্গে মন্টুর আপন মামা মোঃ সোলায়মান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এমন কোনো খারাপ কাজ নেই যা মন্টু করেনি। গরু চুরি থেকে শুরু করে ডাকাতি, রাহাজানি, 'সীমানা পিলার চুরি সবই সে করেছে। নকশাল মারার কথা বলে লক্ষ্মীপুর, শ্রীপুর, যাত্রাপুর, দাপুনিয়া, গারুলিয়া, কাছারপুর এলাকায় ১৫০টি বাড়িতে সে ডাকাতি করে।' জানা যায়, গ্রামগুলো থেকে মন্টু এ পর্যন্ত অর্ধকোটি টাকার চাঁদা আদায় করে। তাছাড়া লুটপাট, ভাঙচুরের ঘটনায় মন্টু বাহিনী গ্রামবাসীর প্রায় সমপরিমাণ টাকার সম্পত্তি ক্ষয়-ক্ষতি করে।

ক্ষমতার নেপথ্যে

দেশের রাজনৈতিক দলগুলোই আজ মন্টুকে এতো বড় বাহিনী চালাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। প্রতি সরকারের আমলে সে তৎকালীন সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলে। থানা, মন্ত্রী, এমপিকে দিতো নিয়মিত বড় অঙ্কের টাকা। আর তাই গ্রামবাসী ওপর অত্যাচার চালালেও তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হতো না। এখনও নেয়া হয় না। স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে পাবনা সন্ত্রাসকবলিত এলাকা হিসেবে পরিচিত। বিপ্লবের নামে মানুষ হত্যা, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ নিয়মিত ঘটনায় দাঁড়ায়। পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নামে এ সন্ত্রাস দীর্ঘদিন যাবত চলছে। '৮০ দশকের শেষ দিকে ডিকসির বিলে ১২টি হত্যাকান্ড ঘটায় তারা। যাদের আওয়ামী লীগ কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলো। সেই থেকে পূর্ববাংলা, আওয়ামী লীগের দ্বন্দ্ব শুরু। পরে এ প্রক্রিয়ায় জামায়াত, বিএনপিসহ সবাই যুক্ত হয়। সঙ্গে দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ তো আছেই। যখন যে দল ক্ষমতায় এসেছে তারাই পূর্ববাংলা নামক সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করেছে। বিরোধীদের দমন করেছে। এক সময় আশ্রয়দাতাদেরও হত্যা করেছে তারা। কিন্তু ১৯৯৫-র পর থেকে পাবনায় পূর্ববাংলার অবস্থান দৃঢ় হতে থাকে। বর্তমানে পাবনার আতাইকুলা, আটঘরিয়া থানা এলাকায় পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) এবং পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টির উত্থানের পেছনে দায়ী আওয়ামী লীগ সরকারের ভুল সিদ্ধান্ত। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগের ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা তথাকথিত নকশাল নিধনের কাজে নামে। তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিম বলেছিলেন, '৭ হাত মাটির নিচ থেকে অপরাধী তুলে আনবো' এই স্লোগানকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগের মাঠপর্যায়ের টাউট-বাটপাররা, সুবিধাবাদীরা নকশাল নিধনের

‘ওসি কোবাদ হোসেনের বিরুদ্ধে গত ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা রিপোর্ট আইজিপি বরাবর পেশ করেছি। কিন্তু তার বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি’

কাজী মোঃ ফজলুল করিম *অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পাবনা জেলা*

নামে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার শুরু করে। পাবনা সদরের গয়েশপুর ইউনিয়নে তখন চরম অত্যাচার করে। নকশাল বাহিনীর কথা বলে সাধারণ মানুষের বাড়ি থেকে চাঁদা তোলা শুরু হয়। এ পর্যায়ে আওয়ামী বাহিনীর হাত থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ মানুষ পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়া শুরু করলো। এমন পরিস্থিতিতে তৎকালীন পাবনার এসপি আসাদুজ্জামান মিয়া তথাকথিত নকশাল নিধনের নামে ৪টি বাহিনী তৈরি করে। লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাইফুল্লাহ বিশ্বাস মন্টুকে নিয়ে মন্টু বাহিনী, গয়েশপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহীদুজ্জামান শহীদকে দিয়ে শহীদ বাহিনী, ভাড়েরা ইউনিয়নের সাইদকে দিয়ে সাইদ বাহিনী এবং ধনুয়াঘাটা ইউনিয়নে সেলিম বাহিনী গঠন করা হয়। পুলিশের সঙ্গে এসব বাহিনীর লোক থাকতো। বাহিনীর লোকেরা পুলিশকে দেখাতো কোন বাড়িতে নকশাল রয়েছে। পুলিশের ছত্রছায়ায় এই বাহিনীর গুন্ডারা বিভিন্ন বাড়িতে চাঁদা চাইতো। চাঁদা না দিতে পারলে নকশাল বলে ঐ বাড়ির পুরুষদের পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিতো। এমনই এক পরিস্থিতিতে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) কার্যক্রম পাবনা শহর ছেড়ে আতাইকুলা, সুজানগর, আটঘরিয়া থানা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। নিজের ঘর-বাড়ি, জমি-জিরাত বাঁচাতে গ্রামের মানুষ পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে থাকে। ফলে গ্রামের এক শ্রেণীর যুবকের হাতে অস্ত্র চলে আসে। পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির এই দলে রয়েছে পুরনো কিছু কমিউনিস্ট পার্টির লোকজন, গ্রামের সাধারণ অত্যাচারিতরা এবং গ্রামের কিছু মানুষ যারা মনে করে এদের সঙ্গে থাকলে নিজের জমি রক্ষা করা যাবে। তাছাড়া গ্রামের কিছু অশিক্ষিত যুবক চাঁদা তোলার জন্যও এদের সঙ্গে মিলে যায়। ফলে গ্রামের নিরক্ষর, সুবিধাবাদী, অত্যাচারিতদের নিয়ে দলে ভারী হয়ে ওঠে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) বর্তমানে দলের প্রাক্তন নেতারাও আজ পরিণত হয়েছে সুবিধাভোগীতে। বাম রাজনীতির ত্রুটিপূর্ণ ধারা গ্রহণ করে তারা কর্মীদের শুধু শেখাচ্ছে হত্যা আর লুট। ফলে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) বাহিনীগুলোর জন্য লুট, অত্যাচার, অর্থ আত্মসাৎ-এ প্রতিদ্বন্দ্বী দলে পরিণত হয়েছে। এ কারণে প্রায়ই পূর্ববাংলার কমিউনিস্টদের সঙ্গে বাহিনীর সংঘর্ষ হচ্ছে। কিন্তু বাহিনীর কাছে এই পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট বা নকশাল ট্রাম্পকার্ডে পরিণত হয়েছে। নকশাল উচ্ছেদের নামে তারা সাধারণ মানুষের উপর জোর-জুলুম চালাচ্ছে।

বিএনপির সাংগঠনিক দুর্বলতা

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অন্য বাহিনীগুলো কিছুটা বেকায়দার মধ্যে পড়ে গেলেও মন্টু বাহিনী তার অত্যাচার চালাতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হয়নি। জানা যায়, পাবনা সদর আসনের এমপি মাওলানা সোবহান মন্টুর সম্পর্কে খালু হয়। তাছাড়া মন্টু বাহিনীর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হেদায়েত উল্লাহর ভাগ্নির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে মাওলানা সাহেবের ছেলে লালের। এসব আত্মীয়তার সূত্র ধরেই বর্তমানে মন্টু বাহিনীর সঙ্গে পাবনার জামায়াত শাখার রয়েছে গভীর সম্পর্ক। এ প্রসঙ্গে এমপি মওলানা আব্দুস সোবহান সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, ‘মন্টু চেয়ারম্যান আওয়াম লীগ করতো। সে অপরাধ জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত। তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।’ মন্টুর সঙ্গে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি তা এড়িয়ে যান।

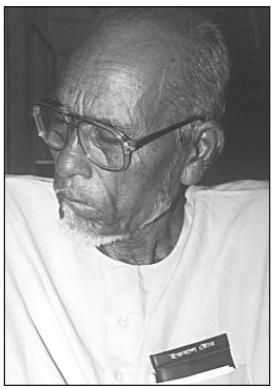

লক্ষ্মীপুরের চেয়ারম্যান আব্দুল গফুর

পাবনা এলাকায় বিএনপিতে বর্তমানে সাংগঠনিক দুর্বলতা রয়েছে। আর এই সুযোগে বাহিনী নির্বিঘ্নে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ এমনকি বিএনপির নেতা-কর্মীরাও আজ বাহিনীর অত্যাচার থেকে রেহাই পাচ্ছে না। জামায়াতে ইসলামী বর্তমানে পাবনার রাজনীতিতে শীর্ষ স্থানে রয়েছে। একদিকে তারা মাঠ পর্যায়ের রাজনীতি গুছিয়ে নিচ্ছে, অন্যদিকে জামায়াতের ছত্রছায়ায় পাবনা থানাগুলো বিএনপির রাজনীতিবিদদের সামান্য মূল্যায়নটুকু করছে না। বিএনপির সাংগঠনিক দুর্বলতা আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের কোনো যৌক্তিক দাবিও আজ পাবনা প্রশাসন শুনছে না। কিন্তু বিষয়টি মেনে নিতে নারাজ পাবনা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার হাবিবুর রহমান তোতা। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, ‘আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা নেই। কিন্তু পাবনা পুলিশ প্রশাসন আমাদের কথা শোনে না। ১১ মে ৪ জন খুনের পর আমি এএসপিকে বলি সেখানে পুলিশ দিতে কিন্তু এএসপি আমাদের কোনো কথা শোনেনি। পরদিন আরো দুটি হত্যার ঘটনা ঘটে। আমি বলতে পারি, আতাইকুলা থানার দায়িত্বে যারা ছিল তারাই ১২ মের হত্যার জন্য দায়ী। তিনি বলেন, আমরা বারবার বলেছি লক্ষ্মীপুরে একটি স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প করতে কিন্তু কেউই আমাদের কথা শোনে না। আমি মনে করি ওসি কোবাদ হোসেনের জন্য আতাইকুলা থানায় ৭-৮টি খুন হয়েছে।’

বিভক্ত থানা পুলিশ

আতাইকুলা ফরিদপুর থানা পুলিশ আজ দু’ভাগে বিভক্ত। একদল সর্বহারাদের শেল্টার দেয়, অন্য দলের সখ্য রয়েছে বিভিন্ন বাহিনীর সঙ্গে। মন্টু চেয়ারম্যান আতাইকুলা থানার ওসি কোবাদ হোসেনকে প্রতি মাসে ৩০ হাজার টাকা দিতো। এই থানা এলাকায় কোনো খুন হলে সবচেয়ে বেশি খুশি হতো ওসি কোবাদ হোসেন। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্মীপুরের গ্রামবাসী জানান, ১১ মে লক্ষ্মীপুরে ৪ জন খুন হলো, কিন্তু গ্রামে কোনো পুলিশ রাখা হলো না। পরদিন যখন লক্ষ্মীপুরের শেখপাড়া মন্টু বাহিনীর লোকজন ঘিরে ফেললো, তখন আমরা মোবাইলে ওসি কোবাদ হোসেনকে খবর দিলাম। পুলিশও তৈরি ছিল কিন্তু কোবাদ হোসেন খবর পাওয়ার সোয়া ১ ঘণ্টা পর গাড়িতে উঠলেন। লক্ষ্মীপুর ব্রিজের ওপর নিয়ে কোবাদ হোসেন সাইরেন বাজিয়ে দিলেন। ফলে মন্টু বাহিনীর লোকজন সহজে পালিয়ে যেতে পারলো।’ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, মন্টু বাহিনীর সঙ্গে পুলিশের সখ্য না থাকলে আগের দিন যেখানে ৪টি খুন হলো সেখানে কেন পুলিশ থাকবে না। জানা যায়, আতাইকুলা থানার সঙ্গে পুলিশের বড় কর্মকর্তারা জড়িত রয়েছেন। এই থানা নিয়ে পুলিশের ওপর জামায়াত নেতাদের চাপ রয়েছে। তাই অভিযোগ থাকার পরও আতাইকুলা থানার ওসিকে এতদিনেও এখান থেকে সরানো হয়নি। পাবনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কাজী মোঃ ফজলুল করিম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, ‘ওসি কোবাদ হোসেনের বিরুদ্ধে গত ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা রিপোর্ট আইজিপি বরাবর পেশ করেছি। কিন্তু তার বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।’

মন্টু এখন পলাতক কিন্তু তার ভয়ে সাধারণ মানুষজন আজ মুখ খুলে না। ভাই, পিতা, বোন হারানোর বিচার আজ তারা চায় না। শুধু চায় আগামী দিনগুলোতে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা। গ্রামের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী মনে করেন এ মুহূর্তেই মন্টু বাহিনীকে নির্মূল করতে হবে। তা না হলে ভিটেবাড়ি ছেড়ে অচিরেই তাদের অন্যত্র চলে যেতে হবে।

ছবি : **খালেদ সরকার**